সম্পাদকীয়

'আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী
প্রেমের লাবণ্যে, স্নেহে, কর্মিষ্ঠতায় আশ্বিনের স্বচ্ছ স্রোত
পাড়ে পাড়ে ঝিকিমিকি — এক ও অনেক।'

শুভ নববর্ষ! স্বাগতম ১৪১২। আজ পহেলা বৈশাখ। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন। পহেলা বৈশাখ কি শুধুমাত্র বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন? শুধুমাত্র একটি নিছক আনন্দ উৎসবের দিন? একেবারেই না। কাল ও সময়ের পরিক্রমায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এর সার্বজনীনতা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিকে — 'পহেলা বৈশাখ'-কে বহুমাত্রিক চারিত্র্য দান করেছে। বাংলা নববর্ষ আজ সবচেয়ে বড়ো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব। কারণ এ সময় পুরো জাতিই তার মূল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পায়। বর্ষবরণের ঐতিহ্যবাহী আয়োজনে বাঙালি খুঁজে নেয় আপন সত্ত্বা, ভালোবাসা আর স্বকীয়তার অনুভব। কল্যান ও নতুনের প্রতীক হয়ে আমাদের জীবনে আসে নববর্ষ - ঘোষণা করে ভিটেমাটির ঠিকানা। ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের অংশগ্রহন এ দিনটিকে এক অনন্য রূপ দিয়েছে।

আমাদের অস্তিত্বের মূলে কী, তা ঘোষণা করি আমরা আজ। প্রকাশ করি আপন সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা। এখানেই পহেলা বৈশাখ উদযাপনের অকৃত্রিমতা। এই নববর্ষ উদযাপন করতে, তাকে নিজের মতো করে পেতে, আমাদের করতে হয়েছিল দীর্ঘ সংগ্রাম। এটি নিছক আনন্দ উৎসব নয় আর! অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতির চেতনার বিকাশের সময়টিতেই পহেলা বৈশাখ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। সেই চেতনার পথ ধরেই একুশে ফেব্রুয়ারী - আমরা পেয়েছি রাষ্ট্রভাষা, সেই চেতনার পথ ধরেই মহান মুক্তিযুদ্ধ - আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন বাংলাদেশ!

একটি জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। আর যুগ যুগ, শতবর্ষ ধরে যে সংস্কৃতির বীজ আমরা বহন করছি, তা শত বাঁধা বিপত্তিতেও উপ্ত রয়ে যাবে আমাদের মনে — এই প্রবাসে, বা অন্য কোনোখানে, যতো দূরেই থাকিনা কেনো, সেই শেকড়ের সাথে সংযোগ যেনো কখনোই বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে — এই হোক প্রত্যয়।

‘আকাশলীনা’র সমস্ত কবি, লেখক ও লেখিকাদের, কাছের ও দূরের, যাঁরা শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসের এ যান্ত্রিক জীবনে লেখা পাঠিয়েছেন মনে করে, ভালোবেসে, বড়ো যত্ন করে - সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ‘আকাশলীনা’র এ

বছরের প্রচ্ছদটি এঁকেছেন ঢাকা থেকে নাজিয়া আন্দালীব প্রিমা। প্রিমা ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ফাইন আর্টস-এ মাস্টার্স করেছে। বর্তমানে Freelance Artist, Web and Graphic Consultant হিসেবে কর্মরত আছেন। প্রিমাকে বৈশাখী শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।
এবার কবি ও লেখকদের নামের বানানের আদ্যক্ষর অনুযায়ী লেখাগুলো সাজানো হয়েছে, অন্য কোনো মানদন্ডে নয় - ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও এবার ‘আকাশলীনা’-য় নতুন সংযোজিত হলো ‘কবি ও লেখক পরিচিতি’। আশা করছি, আপনাদের ভালো লাগবে।

ইচ্ছে রইলো, আগামী বৈশাখ থেকে ‘আকাশলীনা’ আরো বড়ো পরিসরে বই আকারে বাঁধাই করে বের করার।

সবাইকে পহেলা বৈশাখের নিরন্তর শুভেচ্ছা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা।
শুভ নববর্ষ।

জিনিয়া
১লা বৈশাখ, ১৪১২
১৪ই এপ্রিল, ২০০৫

সম্পাদকীয়

যে পৃথিবী সব চাইতে সুন্দর, তা আজও আমরা পাইনি
সব থেকে সুন্দর শিশু, আজও বেড়ে ওঠেনি
মধুরতম যে কথা বলতে চাই, তা আজও আমরা বলিনি।

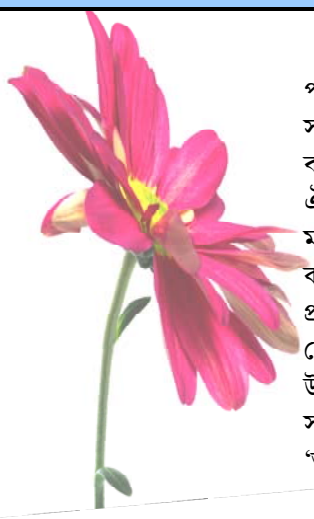

শুভ নববর্ষ! ১৪১০ বঙ্গাব্দের সূচনা হলো। সময়ের পরিক্রমায় পহেলা বৈশাখ আজ ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালির সবচেয়ে বড় উৎসব। শুধু বর্ষ পরিক্রমায় নয়, বাঙ্গালী জাতির স্বাতন্ত্র, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও আবহমান ঐতিহ্যের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত বাংলা নববর্ষ দেশের মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনকে আরও গাঢ় করে তোলে। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে, এতোদূরে, এই প্রবাসেও তার স্পর্শ এসে লাগে আমাদের দেহে-মনে-প্রাণে। সে ছোঁয়াটুকুই আমার অনুপ্রেরণা, সে ছোঁয়ার চেতনাই আমাকে উদ্দীপিত করে শত বাঁধা আর ব্যস্ততার মাঝেও কিছু একটা করার সবাইকে নিয়ে। যা হবে অকৃত্রিম - স্বতঃস্ফূর্ত - নিঃস্বার্থ। 'আকাশলীনা'র যাত্রা সে আদর্শকে সামনে রেখেই।

যদিও এবারের বাংলা নববর্ষটি এসেছে একটা খুব অস্থির সময়ে। শক্তি ও ক্ষমতা থাকলে যে কোন কিছুই করে ফেলা সম্ভব - ভয়ংকর অসুন্দর অথচ ভীষণ এই সত্যটিই আবার প্রতিষ্ঠিত করা হলো। প্রার্থনা আর শুভ কামনা ছাড়া আমরা আর কিই বা করতে পারি! তবু প্রত্যয়ের সঙ্গে অন্তত এটুকু বলতে পারি - আমরা যুদ্ধ চাই না। নতুন বছর আমাদেরকে দৃঢ় ভাবে দাঁড় করাক মানবতার পক্ষে, শান্তির পক্ষে।

'আকাশলীনা'র এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। গতবারের মতো এবারও প্রবাসী বাঙ্গালীদের লেখাই প্রকাশ করা হয়েছে একটি দু'টি ছাড়া। আমার বিশ্বাস, লেখাগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। সব না হলেও অন্ততঃ একটি লেখাও যদি কারো ভালো লাগে, আমি আমার এ পরিশ্রমকে সফলতা মনে করবো।
সবাইকে পহেলা বৈশাখের নিরন্তর শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। শুভ নববর্ষ।

জিনিয়া
১লা বৈশাখ, ১৪১০
১৪ই এপ্রিল, ২০০৩

বাচ্চাদের সফটওয়্যার

শামীম তুষার

চমৎকার একটা লার্নিং সফটওয়্যার চলছিল ফজলুর রহমান সাহেবের বেডরুমে। জাম্প স্টার্ট প্রি স্কুল। আঠারো ইঞ্চি মনিটরে ক্লাসরুমের ছবি। মিষ্টি চেহারার ভালুক আর গোলগাল হাতি পড়ে সেই ক্লাসে। ক্লাসরুমের বইয়ের ওপর ক্লিক করলে মলাট খুলে যায়। খেলনার বাক্সের ওপর ক্লিক করলে খেলনাগুলো বেরিয়ে আসে। রহমান সাহেবের তিন বছরের ছোট ছেলে একাই চালাচ্ছিল সফটওয়্যারটা।

সফটওয়্যারটা ভালো। বাচ্চারা একা একাই চালাতে পারে। বাবা-মা সঙ্গে না থাকলেও চলে। সিডি রমের কভারে লেখা আছে, একা একা অপারেট করলে নাকি বাচ্চার আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

রহমান দম্পতি খুবই সন্তুষ্ট। এতো ছোট বয়সেই লার্নিং সফটওয়্যার দিয়ে কম্পিউটারে বাচ্চার হাতেখড়ি করাতে পেরে ।

তবুও পুরোপুরি মন ভরেনি মিসেস রহমানের। বড় মেয়েটার জন্যও কিছু সফটওয়্যার আনবেন বলে ঠিক করেছেন। ফিশার প্রাইস রেডি ফর স্কুল, ক্র্যায়োলা মেক আ মাস্টার পিস। কত কত নাম। রেডি ফর স্কুল সফটওয়্যারটা দোকানে দেখেছেন চালাতে। এটা চালালে বোঝা যায়, বাচ্চা বাড়িতে কতো দূর শিখল। স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত হলো কি না? ঘড়ির দোকানের ছবি আছে সফটওয়্যারটার এক জায়গায়। ওয়ান টু নাম্বার ঠিকমতো বলতে হয় এখানে। বলতে হয় কোন ঘড়িতে কয়টা বাজে। ঠিক মতো বলতে পারলেই পয়েন্ট পাওয়া যায়। ছোটখাটো ম্যানারিজম, ভদ্রতাও শেখানো হয় সফটওয়্যারটাতে। কারো খেলনা খেলতে আনলে থ্যাংক ইউ বলতে হয়। টেলিফোন ধরে সুন্দর করে হ্যালো বলতে হয়।

ক্র্যায়োলা সফটওয়্যারে ছবি আঁকা যায় ইচ্ছে মতো মার্কার, ক্রেয়ন কিংবা জল রঙ দিয়ে। কাগজে-কলমে নয়। কম্পিউটারের স্ক্রিনে মাউস নেড়ে নেড়ে। তবে মজার বিষয় হলো- এখানকার প্রত্যেকটা রঙ আর রঙ লাগানোর ব্রাশই নানান রকম শব্দ করে। কথা বলে। জলরঙ দিয়ে ছবি আকার সময় পানি গড়িয়ে শব্দ হয়।

সেদিন এক অফিস কলিগের বাড়িতে আরেকটা ভালো সফটওয়্যার দেখেছেন মিসেস রহমান। সেটা অবশ্য একটু বড়দের জন্য। ফ্রেঞ্চ ফর দি রিয়াল ওয়ার্ল্ড। ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে মোটর গাড়ির রেস। প্রতিদ্বন্দ্বী হলো কম্পিউটার। বিভিন্ন শব্দ আর ছবি দেয়া হয় ড্রাইভিং-এর সময়। খুব তাড়াতাড়ি সেসব শব্দের প্রতিশব্দ বলতে হয়। ছবির সঙ্গে মিল রেখে ছবি খুঁজে বের করতে হয়। যতো তাড়াতাড়ি শব্দ আর ছবি দেয়া যায় তত বেশি এগিয়ে থাকা যায় রেসে। পথে আবার তিনটা শহরে আসতে হয়। ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে হয় এখানকার লোকদের সঙ্গে। সত্যি সত্যি কম্পিউটারের সঙ্গে লাগানো মাইক্রোফোনে কথা বলতে হয়, বিদেশি ভাষায় ছোটখাটো শব্দগুলো লেখা বা বলার জন্য সফটওয়্যারটা খুবই পছন্দ হয়েছে তার।

পছন্দ হওয়ারই কথা। মিলিয়ন ডলারের মালমসলা, চাইল্ড সাইকোলজিস্ট এডুকেশনাল স্পেশালিস্টদের সযত্ন তত্ত্বাবধান আর মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ডেভেলপারদের অহর্নিশ পরিশ্রমে তৈরি সফটওয়্যারগুলো যখন ঝকঝকে সিডি রমে ভর্তি হয়ে বাজারে আসে তখন খুব কম লোকেই সেগুলোকে অপছন্দ করতে পারে। ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে রীতিমতো সমীহের চোখে তাকান বাবা মায়েরা।

এই হলো লার্নিং সফটওয়্যার। কেউ কেউ বলেন, চিলড্রেন্স সফটওয়্যার বা এডুটেইনমেন্ট সফটওয়্যার। আনন্দ আর বিনোদনের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শেখানোর জন্য আট মাস ষোল বছর বয়সীদের উপযোগী করে তৈরি করা হচ্ছে এসব সফটওয়্যর। লাখ লাখ বিক্রি বাড়ছে প্রতি বছর। '৯৭ সালে সাড়ে ১০ লাখ কপি, '৯৮ সালেই প্রায় ২১ লাখ কপি। ওয়ান্ট টু গিভ ইয়োর চাইল্ড দি বেস্ট পসিবল স্টার্ট ইন লাইফ? এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুই হাত ভর্তি সিডি রম নিয়ে বাড়িতে ফিরছেন আমেরিকান বাবা-মায়েরা। বুঝেশুনে কিনছেন আমাদের সচ্ছল বাবা-মায়েরাও। ফল হচ্ছে চমৎকার। বসতে শেখার আগেই মাউস ধরতে শিখছে বাচ্চারা। সাইকেলে চড়তে শেখার আগেই শিখছে কম্পিউটার গেমের চিট কোড। বহির্মুখী দুরন্ত ছেলেমেয়ে নয়। তৈরি হচ্ছে অন্তর্মুখী, কম্পিউটার ঘেঁষা এক নতুন প্রজন্ম। নেট জেনারেশন। টিনএজার নয়, স্ক্রিন এজার।

তাতে সমস্যা কি? ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে ধরে হেঁটে চলা গ্লোবাল ভিলেজের মানুষজন ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের কম্পিউটারের সামনে এনে বসাবে। এতে অবাক হওয়ার কী আছে? লার্নিং সফটওয়্যার নিয়ে এ ছেলেমেয়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাবে, খেলবে শিখবে–ক্ষতিটা কী?

ক্ষতি নেই। আবার ক্ষতিও আছে। পশ্চিমের পণ্ডিতদের ভেতরেই দুটো দল তৈরি হয়ে গেছে এ নিয়ে।

এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট জেন হিলি আছেন এক দলে। ফেইলিওর টু কানেক্ট বইতে তিনি বলেছেন, কমপিউটারের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় কাটালে তা ছোট বাচ্চাদের বুদ্ধিশুদ্ধি গঠনে মারাত্মক ক্ষতি করে। হিলির মত হলো–বাচ্চারা বিভিন্ন জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতেই বাস্তব পৃথিবীকে চিনতে শিখবে। একদিন দুষ্টুমি করে মরিচে কামড় দেবে বুঝবে সেটা ঝাল। আর কখনো ভুলবে না সেটা। একবার দুই বার পানিতে পড়বে বুঝবে হাত-পা না নাড়লেই ডুবতে হয়। সাঁতার শেখা হয়ে যাবে আপনাতেই। জল রঙে ব্রাশ ডুবিয়ে ছবি আঁকতে গেলে জামা-কাপড় হয়তো নষ্ট হবে। কিন্তু কাগজের ওপর ব্রাশ ঘষে রঙ করার যে মজা সেটা কখনোই পাওয়া যাবে না সফটওয়্যারের ছবিতে কার্সার বসিয়ে রঙ করে।

নিজের হাতে করে, নিজের চোখে দেখে আশপাশের মানুষজন পরিবেশ থেকে শেখার যে হাজার বছরের অভ্যাস আমরা গড়ে তুলেছি তার অনেকটাই হয়তো বদলে যাবে লার্নিং সফটওয়্যারের কারণে।

কিন্তু সে রদবদল কি ভালো হবে? হিলির উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে প্লেইং উইথ দি ফিউচার গ্রন্থের লেখক ডগলাস রাশকফ, গ্রোয়িং আপ ডিজিটাল-এর লেখক ডন ট্যাপ্সকট বলছেন, অবশ্যই ভালো হবে। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে যে জটিলতা আর দ্রুতগতির পরিবর্তন আসছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই তৈরি হতে হবে। কম্পিউটারের মাল্টিটাস্কিং আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের ননলিনিয়ার হাইপার লিংক শিখতে হবে দুধদাঁত পড়ার আগেই।

এ ধরনের ভয় ধরানো বক্তব্য, বাবা-মায়েদের অতি আশঙ্কা আর পিছিয়ে পড়ার উদ্বেগকে পুঁজি করেই ব্যবসা করছে, এডুটেইনমেন্ট আর লার্নিং সফটওয়্যারের নির্মাতারা। তারা বোঝাচ্ছে, লার্নিং সফটওয়্যারের বটিকাটা আপনার বাচ্চাকে খাইয়ে দিন, যত ছোট বয়সে

খাওয়াতে পারেন তত ভালো। দেখবেন ভবিষ্যতের রণক্ষেত্রের জন্য কেমন সাহসী একজন যোদ্ধা তৈরি হচ্ছে চোখের সামনে।

কত ছোট বয়সে শুরু হবে এই যুদ্ধ? কাকে নিয়ে যুদ্ধে যাবে ছেলে-মেয়েরা? সিডি রমের কথামতো আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য একা একাই শুরু করবে সফটওয়্যার চালানো? নাকি বাবা, মা, শিক্ষক কেউ থাকবেন আশপাশেই?

এ প্রশ্নগুলো নিয়েই প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড লিখেছেন হিলি। লার্নিং সফটওয়্যার চালিয়ে দিয়ে ছোট বাচ্চাটিকে একা একা ফেলে রাখার তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। তার কথা হলো– বাচ্চারা অবশ্যই লার্নিং সফটওয়্যার ব্যবহার করবে। কম্পিউটারে গেম খেলবে। কিন্তু সেজন্য একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর দরকার আছে। দরকার আছে বাবা-মায়ের একজন বা শিক্ষকের পাশে থাকার। মায়ের এই সান্নিধ্য শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য অতি জরুরি।

হিলি এই কথাগুলো এমনি এমনি বলেননি। ইউনিভার্সিটি অব কানসাস-এর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সাম্প্রতিক এক গবেষণার পর যে রিপোর্ট দিয়েছে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে তাতে প্রমাণ মেলে হিলির কথাগুলো কতটা সত্যি। রিপোর্ট বলছে, জন্মের পর থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত বিশেষ করে প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই বাচ্চাদের মস্তিষ্কের পরিবর্তন ও গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সম্পন্ন হয়। এই সময়ের মধ্যে বাচ্চার সঙ্গে বাবা-মা যত কথা বলেন, তাকে যত আদর করেন, যত বেশি সময় দেন– তার প্রতিটি সেকেন্ড বাচ্চার স্নায়ুকোষ বা নিউরনের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। সহজ কথায়, বাবা-মায়ের সান্নিধ্যই বাচ্চার আইকিউ বাড়িয়ে দেয়। বাবা-মা শিক্ষিত কি না, তারা চাকরি করেন কি না, তাদের আর্থিক অবস্থা কেমন কিংবা তারা বাচ্চাকে ছোটবেলায় লার্নিং সফটওয়্যার কিনে দেবেন কি না– তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে বাবা-মা কতক্ষণ বাচ্চার কাছাকাছি থাকলেন।

বাচ্চার বয়সটা তাই মাথায় রাখতে হবে। চিন্তা করতে হবে, কতটা সময় সে কাটাবে কম্পিউটারের সমানে। লার্নিং সফটওয়্যারকে অবশ্যই জায়গা করে দিতে হবে। কিন্তু সেজন্য বাবা-মার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে চলবে না।

অবিনাশী যাত্রী

পূরবী বসু

ev‡bi জলে ভেসে আসিনি আমি।

তবে নৌকা করে সাগর পাড়ি দিয়েছিলাম। আমারও ঘর ছিল দোর ছিল। ছিল লোহার শিকের জানালা। ঘরের ভেতরে ছিল বুড়ো মা-বাবা। দুলাল। আজ কেউ নেই। কিছু নেই। তবু সেখানেই ফিরে যাচ্ছি।

আমার পাশের যাত্রী লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান ছেলেটি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে। সেই কখন থেকেই তো বক বক করে যাচ্ছি। এই ছেলে, তমাল, সেও এসেছিল এ দেশে ভাগ্যান্বেষণেই। ডিভি লটারি পাবার সৌভাগ্যে। এখন তিন সপ্তাহের জন্যে দেশে ফিরছে বিয়ে করতে। এটুকুই শুধু নিজের সম্পর্কে বলেছে সে। আর কিছু জানি না।

সৌভাগ্যবানদের বেলায় হয়ত তাই ঘটে। লটারি পেয়ে আমেরিকা যাত্রা, এতো স্বপ্নের আশা করা যেত না আমাদের সময়। আর সখ করে বিয়ে করতে যাওয়া দেশে? তাও এখানে আসার দু'বছর পরেই? মাত্র তিন সপ্তাহের জন্যে পাগল? সে পয়সা কোথায়? সময় কোথায়? ভিসা---------- কোথায়?

সে লোকটির বরফের মত ঠাণ্ডা দেহটা উড়োজাহাজের খোলসে করে নিয়ে যাচ্ছি দেশে, তার নীল রং-এর পাসপোর্টটা এখন আমারই ব্যাগে, আমার অনুরূপ পাসপোর্টের সঙ্গেই রয়েছে। এই ছোট্ট নীল বইটিই তার সাথে আমার যোগসূত্রের সূচনা। অথচ কী অনায়াসে সেটা ফেলে রেখে দিব্যি চলে গেল লোকটা। সে কি জানত না কী বিরাট দামি জিনিস ছিল ওটা? নাকি সেটার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল তার?

আমার কথা অবশ্য আলাদা। আমি বানের জলে ভেসে আসিনি। তবে নৌকা করে সাগর পাড়ি দিয়েছিলাম। সে কি ঢেউ? তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে উঠছিল আমাদের ছোট্ট নৌকো। আমার সঙ্গীরা ছিল সবই পুরুষ। যবুথবু হোয়ে এক কোণে বসেছিলাম আমি। হাসান আর বীরুকে ছাড়া আর কাউকে চিনতাম না ঐ নৌকোর। যদিও প্রায় সকলেই বাঙালি। হাসান আর বীরু এসেছিল আমার সঙ্গে জার্মানী থেকে। একই প্লেনে বণ থেকে উড়েছিলাম আমরা বাহামার উদ্দেশ্যে। সে কি আজকের কথা? তেইশ বছর হোয়ে গেল দেখতে দেখতে। বিমান বন্দরে শেষ মুহূর্তে পারুল হাতের মধ্যে গুঁজে দিল একটা পুটুলী। কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'এখন খুলিস না। পরে দেখিস। বলা তো যায় না কাজে লাগতে পারে। কোথায় কেমন করে থাকবি তো জানে?'

প্লেনের ব্যথরুমে একান্ত নিভৃতিতে বাদামি রং-এর প্যাকেটটা খুলে আমি স্তম্ভিত হোয়ে পড়েছিলাম। আমার বন্ধু পারুল আমায় তিন প্যাকেট 'পিল' দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে, যদিও তার

চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানে না আমি এখনো পর্যপ্তা কুমারী। জার্মান ভাষায় লেখা থাকলেও পিল চিনতে ও তার কার্যকারিতা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমার। পারুলের সঙ্গে বহু বছর পর যখন নিউইয়র্কে আবার দেখা হয়েছিল, ওর দূর দৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারিনি। অসীম মমতায় শুধু জড়িয়ে ধরেছিলাম ওকে। চায়নিজ দোকানে কাঁচা মাছের দিকটাতে কাজ করছিল বলেই হয়ত পারুলের সর্বাঙ্গে মাছের গন্ধ ভুরভুর করছিল। মিতার বয়স তখন পাঁচ। অর্ণবের তিন। ওদের জন্যে চিংড়ি, ক্যাটফিস কিনতে গিয়েছিলাম আমি। এই এখনো পর্যন্ত পারুল সেই দোকেনেই কাজ করে। তবে কাঁচা মাছ নাড়াচাড়া করতে হয় না আর। পারুল এখন ক্যাশিয়ার।

এজেন্টরা ঠকায়নি আমাদের। বাহামায় থাকা খাবার ব্যবস্থা খুব খারাপ ছিল না। এমনকি আমি একা মেয়ে বলে এক স্থানীয় মহিলার বাসায় রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল আমার। সারারাত ধরে সেই মহিলা গাঁজাজাতীয় নেশায় বুঁদ হয়ে বারান্দায় বসেছিল তার পুরুষ সঙ্গীর সাথে। তার মাথায় সরুসরু সহস্র বিণুনী। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম কোণের ঘরে। কিম্বা ওরা আমায় বিরক্ত করেনি। মনে আছে সে রাতে পূর্ণিমা ছিল অবিকল একই রকম চাঁদ ছিল আকাশে।

নৌকোটা পার পর্যপ্ত আসতে পারবে না বলেই দিয়েছিল ওরা। ঝুপঝাপ করে জলে লাফিয়ে পড়তে হয়েছিল নৌকো থেকে দীর্ঘ সময় এভাবে আমার জন্যে সাঁতার জানাটা জরুরি কেন তখন বুঝতে পেরেছিলাম। ভোর হোতে তখন খুব দেরি নেই। বীচ ছিল ফাঁকা, ভেজা কাপড়ে যদি কোনমতে বালুচড়টা হেঁটে শহরে ঢুকে যেতে পারি আমরা, আর কোন ভয় নেই। উকিলের নাম -ঠিকানা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগেই রয়েছে। কিন্তু আমরা সবাই একইরকম ভাগ্যবান ছিলাম না। তাই কেউ ধরা পড়ল কেউ পড়ল না। আমি ছিলাম হাজতে দু'দিন। পুলিশটা যাই জিজ্ঞেস করে কিছুই বুঝি না বা না বোঝার ভান করি। থানায় নিয়ে তারা একজন দোভাষী নিয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ভয় আমি খুব পাইনি। কারণ, আমি জানতাম একবার যখন এ দেশের মাটিতে পা দিয়েছি, আমাকে তাড়াতে আর পারবে না। কেউ। বারণ্ন ও ধরা পড়েছিল। ভাগ্যিস হাসানটা পালাতে পেরেছিল। ও-ই উকিল, জেল. টাকা পয়সার যোগাড় নিউইয়র্ক ও জার্মানীর বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ সব করেছিল আমাদের হোয়ে। হাসানের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার। নৌকোয় আসতে আসতে কেবল বলছিল হাসান, 'যদি মরে যাই, বউটাকে বলিস আমি বলেছি আনোয়ারকে বিয়ে করে নিতে।' পরে যখন ঠাট্টাচ্ছলে জানতে চেয়েছি, আনোয়ারটা কে, হাসান ও তার স্ত্রী রেবা উভয়েই হেসে জানিয়েছে আনোয়ার হাসানের বাল্য বন্ধু সে রেবার প্রতি দুর্বল ছিল বলে ওরা দু'জনেই টের পেত। যাইহোক, আনোয়ার নয়, রেবার জীবনে স্থায়ীভাবে আসন পেতেছিল হাসানই এই মায়ামী শহরেই। তারা কখনো বসবাসের জন্য নিউ ইয়র্কে যায়নি। ওদের বড় ছেলেটা গত বছর কার ক্র্যাশে মারা গেছে।

বানের জলে ভেসে আসিনি আমি। ----------

তবে নৌকো করে সাগর পাড়ি দিয়েছিলাম। পদ্মা যমুনা মেঘনার দেশের মানুষ আমি। জলকে ভয় করি না। তা সত্ত্বেও ভয় যে একেবারে পাইনি তা নয়। দিন যায়, রাত আসে। শুকনো বিস্কুট, ছোলা জল খেয়ে অথৈ সমুদ্রে অজানার উদ্দেশ্যে চলেছি আমরা। কুলকিনারার সন্ধান কখনো পাব মনে হয়নি। আর ঢেউ! সে কি ঢেউ। প্রতিবার ভেবেছি, আর নয়, এ নৌকো এবার আর সামলাতে পারবে না। কিন্ত পেরেছ। আকাশের গোলাকার চাঁদটা কোণের দিকে একটু ভাঙ্গা, অজস্র তারা নীল আকাশে। ওদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, এই একই আকাশ

কি দেখছে পারুল জার্মানী থেকে, দুলাল তারপাশা থেকে অথবা হারুন ভাই বা ভাবী নিউইয়র্ক

থেকে? আমরা কি কখনো ডাঙ্গায় পৌঁছাতে পারব? কালো জলের ওপর কেবল অনবরত ছলছল শব্দ। মাঝির ভাষা বুঝি না। সে আমাদের কথা বোঝে না। দু' একটি ইংরেজি জানে সে। আমাদের অবস্থাও একই রকম। তা দিয়েই কাজ চালাই কোনমতে। আর আশা করি তীরে পৌঁছোবার। যতদূর জানি আমাদের মধ্যে কেউ ডিগ্রিধারী নেই। হাসান ছাড়া ইউনুস বলে এক লোক আছে সে কলেজ পর্যন্ত গিয়েছিল। এপাশে নৌকোর ওপাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে যে ভিন্নদেশী তিন কালো লোক, ওদের ভাষা কী জানি না। ওরা মাঝে মাঝে শুকনো লম্বা রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে আস্তে বিড়বিড় করে কথা বলছে।

হারুন ভাই আমার আত্মীয় নয়। প্রতিবেশীর আত্মীয়। তাদের এস্টোরিয়ার এপার্টমেন্টের ঠিকানা, ফোন নম্বর নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে করে। নিউইয়র্কে পৌঁছে প্রথম রাতেই তাদের বাসায় যাই। রাত বিরেতে একটি বাঙালি মেয়েকে ঘরের বাইরের ফেলে দেওয়া যায় না এই বিবেচনাতেই সে রাতটা তাদের বাসায় থাকতে দিয়েছিল আমায়। পরদিন সকালে চারটি সাবওয়ের টোকেন, পাঁচটি ডলারও অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত একটি স্থানীয় পাক্ষিক বাংলা খবরের কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হারুন ভাই ও ভাবি হনহন করে বেরিয়ে গিয়েছিল কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে। পেছনে বন্ধ করা এপার্টমেন্টের দরজায় দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম দিন শেষে এখানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে তারা চারটি সাবওয়ের টোকেন দিয়ে নাকচ করে দিয়েছে। এখানে আর ফেরা যাবে না।

বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপনটা পড়ে একটু অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যিই বিজ্ঞাপনের জবাবে নিজেই হাজির হব সেখানে সেটা প্রথমে ভাবিনি। যখন ভেবে ঠিক করলাম, তাই------- ---------- করব, ততক্ষণে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে সে ঠিকানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমি। একটা টোকেনও খরচ হোয়ে গেছে ততক্ষণে। সাবওয়ে থেকে মাত্র দু'শতক দূরে একটা বড় লাল রং-এর ইটের এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে সে বাসা।

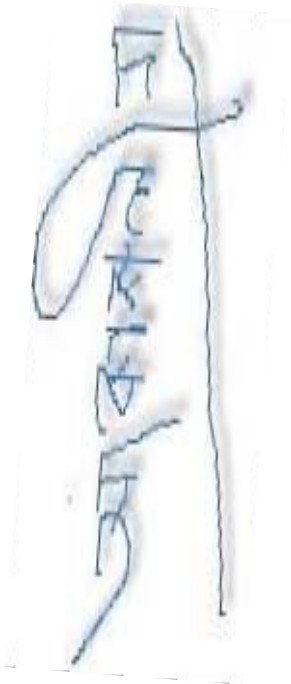

ঘরেই ছিল ভদ্রলোক মধ্য বয়সী। কাঁচাপাকা চুল। সেভ না করা মুখমণ্ডল। একটা ঢিলেঢালা সাদা প্যান্ট ও বাদামী গেঞ্জি শরীরে। দরজা খুলে সোজা প্রশ্ন, 'কী চাই?'

আমি অবাক হই। বুঝল কী করে লোকটা যে আমি বাঙালি? 'জি। আমি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি।'

'ফোন করে আসার কথা ছিল না?' লোকটার মুখে পরিষ্কার বিরক্তি। আমি খবরের কাগজটা আবারো ভালো করে পড়তে চেষ্টা করি, ভুলটা কোথায় হয়েছে বোঝার জন্যে। ফোনই যদি করতে হবে কেবল, পুরো ঠিকানা তা হলে দিল কেন? 'থাক্ থাক্। আসুন। ভেতরে আসুন।' লোকটার মায়া হয় হয়ত আমাকে দেখে। আমি ঘরের ভেতর ঢুকি। এই দিনের বেলাতেও লাইট জ্বালানো। পেছনের দিকে বলে ঘরটা অন্ধকার। হঠাৎ একটু ভয় ভয় হয়। গা'টা ছমছম করে ওঠে।

'অসুস্থ মানুষটি কে? আপনি?'

'কেন দেখে বোঝা যাচ্ছে না? একটা বড় রকম অ্যাটাক হোয়ে গেছে। আমার ডাইবেটিস। হাই ব্লাড প্রেসার। ভাল্বেরও কিছু সমস্যা রয়েছে। একা নিজের দেখাশোনা করা আর সম্ভব হচ্ছে না।

'আপনার গ্রিন কার্ড আছে?'

'গ্রি কার্ড কেন? আমি এদেশের সিটিজেন। আর আপনি?

'কালই এসেছি নিউ ইয়র্ক। থাকতে চাই এখানে। তাই এসেছি আপনার বিজ্ঞাপন দেখে।'

'ও, আপনিই তাহলে পাত্রী?' লোকটি দাঁত বের করে হাসে খ্যাঁক খ্যাঁক করে। একটু কাশেও। তারপর আবার হাসে।

'নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখেছেন কখনো? আপনি কি করে মনে করলেন একজন আমেরিকান বাঙালি, যার বৈধ সিটিজেনশিপ আছে, সে আপনার মত দেখতে একজন মহিলাকে বিয়ে করবে?'

আমি ফোঁস করে উঠি, যদিও আমার চৌকো বালিশের মত দেহ ও থালার মত মাংশলো গোলাকার মুখমণ্ডলকে নিয়ে এই লোকটিই প্রথম কদর্য মন্তব্য করল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি, 'আপনি কী মনে করেন নিজেকে? বুড়ো। ধ্বজা। অসুখে লোক। ডাইবেটিস। ব্লাড প্রেসার। যত্তসব রোগের ডিপো, আপনাকে কে বিয়ে করবে একমাত্র পাগল ছাড়া?'

আমি বেরিয়ে আসি। লোকটা বাধা দিতে চায়। পেছনে পেছনে চলে আসে আমার। আমার কথা শুনে রাগ না করে হাসে লোকটি। জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে যায় উল্টো দিকের একটি কফি শপে। কফি ও ডোনাট খেতে খেতে আমাকে তার জীবনের কথা বলে। তার মধ্যে কোন ভনিতা দেখি না। আমি কিনা শান্ত হোতে পারি না তবু থেকে থেকে লোকটার নিষ্ঠুর মন্তব্য মনে হোতে থাকে আমার। কিন্তু দেখলাম, মানুষটা খুব খারাপ নয়। সেদিনই আমাকে তার পরিচিত একটা লন্ড্রামেটে কাপড় ভাঁজ করার একটা পার্টটাইম কাজ জুটিয়ে দিল। এরপর তার সঙ্গে কেটে গেছে পুরো তেইশটি বছর। সুখে, দুঃখে, অসুখে, বিশ্রামে, শ্রান্তিতে, হাসিতে। মিতার বয়স এখন একুশ। অর্ণবের ঊনিশ। গ্রিন কার্ডের লোভে যেই সম্পর্কের সূচনা, সেটা শেষ পর্যন্ত সেখানেই থেমে থাকেনি। কথাবার্তায় যতই কাটাছেঁড়া করুক। মানুষটা আসলে একেবারে পাষণ্ড নয়। আমাদের বিয়েতে হারুন ভাই ভাবী ছাড়া আরো দুটি পরিবার এসেছিল। এসেছিল বারন্ন। রোগ জরায় কিষ্ট শরীরটা নিয়ে আরো তেইশ বছর বেঁচে থাকবে, কখনো ভাবেনি সে। তবু বেঁচেছিল। আর আমাকে এই নীল রঙের পৃথিবী দেখার ছাড়পত্রটাই নয় শুধু, দিয়েছিল উপহার হিসেবে আরও দুটি প্রাণী, তার অবর্তমানে আমাকে যারা দেখবে বলে তার ধারণা হয়েছিল।

কিন্তু কার্যত তা ঘটেনি। অর্ণব এখন কলেজ ছেড়ে সর্বক্ষণ জ্যামাইকা মসজিদেই পড়ে থাকে। ধর্মকর্ম ছাড়া কোনদিকে তার নজর নেই। ওর দাড়ি ও পোশাক দেখলে কেউ বলবে না ও এদেশে জন্মগ্রহণ করা, বড় হওয়া ঊনিশ বছরের এক যুবক। ওকে দেখলে, ওর হাবভাব লক্ষ্য করলে আমার চেয়েও বয়স্ক মনে হয়। ওদিকে মিতা সারাক্ষণ মেতে আছে ওর বন্ধু-বান্ধব অর্থাৎ এ দেশের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। গান, নাচ, খেলা, মুভি আর পার্টির সঙ্গে কোনমতে পড়াশুনাটাও চালিয়ে যাচ্ছে কেবল। অর্ণব কোনমতেই মেনে নিতে পারে না বোনের এই পশ্চিমী চলাফেরা, জীবনযাপন। মা বোনের সঙ্গে মতানৈক্য, বাবার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি, আর সবশেষে ইরাক যুদ্ধের ঘটনায় মর্মাহত হয়ে অর্ণব একদিন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে মসজিদে গিয়ে পুরোপুরি বসবাস শুরু করল। তার ডাক নামটি পর্যন্ত সে মুছে ফেলেছে এখন। নিজেকে সে পরিচিত করে তার ভালনামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি দিয়ে। অর্ণব নয়, আসিফ বলে পরিচিত হোতেই গর্বিত ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে আমার ছেলে। সে বলে অবশেষে সে তার শেকড়ের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। পেছনের দিকে ফিরে তাকাতেই তার আনন্দ। অন্যদিকে নয়। আর মিতা? ভাইয়ের আচরণে ওর যেন জেদ চেপে গেছে আরও কত ঘন হোয়ে মেইনস্ট্রিম আমেরিকান ইয়াং ওমেন হওয়া যায়। সে এখন লিভ টুগেদার করছে ব্রুকলিনে এক ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে। ক্রমাগতঃ

সিগারেট খায় সে। হয়ত একটু আধটু ড্রাগও নেয়। বাবা মারা যাবার পর খবর পেয়ে এসেছিল এক বেলার জন্যে। বিকেলেই ফিরে গেছে। অথচ আশ্চর্য, ওদের বাবা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত, ওরা আমায় দেখবে, যখন সে থাকবে না। আমি অবশ্য কখনো আশা করিনি, আমার দেখাশুনা কেউ করবে।

বানের জলে ভেসে আসিনি আমি। তবে নৌকো করে সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় এসেছিলাম। দেশে আমার ঘর ছিল। দোর ছিল। ছিল লোহার শিকের জানালা। আমাদের ঘরের ভেতরে ছিল বুড়ো মা বাবা। দুলাল। আরও ছিল কিছু, যা এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলাম। যার সন্ধান জানত না নিকটতম প্রতিবেশী পর্যন্ত। আমাদের ঘর ছিল জমাট দারিদ্র্য ক্ষুধা। যেহেতু ঐ বাড়িতে সচ্ছলতা ছিল এক সময়, চিনত সকলেই, দারিদ্র্য এসেছিল অতি নিঃশব্দে-নীরবে। বাড়ির দরজা, জানালা বা লোকজনের পোশাক দেখে বোঝা যেত না, তাদের ঘরে রাতে ভাত খাবার চাল ছিল কি ছিল না। আস্তে আস্তে অবশ্য সবই গেছে। মা, বাবা, বাড়িঘর, দুলালকে সব ছেড়ে দেশ থেকে পালাতে হয়েছে একদিন। আজ ওখানে কিছু নেই। কেউ নেই।

†jLK I Kwe cwiPwZ:

অমল মিত্রঃ Kবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস। দীর্ঘ ১৬ বছর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে বিজ্ঞানী ও ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে মিসিসিপির হেটিসবার্গ শহরে ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন মিসিসিপির পাবলিক হেলথ বিভাগের অধ্যাপক। বিশেষ গবেষণা পুরস্কারঃ Innovation Award for Applied Research, ২০০৪. প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ–'কবোষ্ণ কলাপ'।

আতিকুর রহমানঃ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। আবৃত্তি করতে ভালোবাসেন। আবৃত্তি ক্যাসেট 'অবিনাশী শব্দরাশি' বের হয় ১৯৯৫ সালে। তিনি ১৯তম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন, ফ্লোরিডা-২০০৫-এর সদস্য সচিব ছিলেন এবং বর্তমানে ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটি (২০০৫-০৬)–এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ঠিকানা' পত্রিকার ফ্লোরিডা প্রতিনিধি এবং স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। 'উত্তর আমেরিকা লেখক ও শিল্পী সংস্থা'র-আহবায়ক। স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ফ্লোরিডার বোকারতানে।

আবু ওবায়দা আনসারী খানঃ কবিতা লেখেন। ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাশ করেছেন ১৯৭৮ সালে। কানাডার ম্যানিটোবা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেছেন পরবর্তী সময়ে। বর্তমানে মিসিসিপির জ্যাকসন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পদার্থ বিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। স্ত্রী ডঃ শায়লা খান ও দু'কন্যা নিয়ে স্থায়ীভাবে জ্যাকসন, মিসিসিপিতে বসবাস করছেন।

আমিনুর রশীদ পিন্টুঃ পেশাগতভাবে ফার্মাসিস্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ফার্ম ডিগ্রীর পর থেকে আমেরিকা প্রবাসী। প্রবাসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শান্তিনগরের মোড়ে।' এছাড়াও রয়েছে কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টি ও শব্দের জন্য প্রার্থনা' এবং সম্পাদিত কবিতা সংকলন–'দশদিগন্ত'।

আলী রীয়াজঃ স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই চমৎকার লেখেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পেশা অধ্যাপনা। ডক্টর আলী রীয়াজ IIIinois State University-এর Dept. of Politics and Government-এর Dean's Award প্রাপ্ত একজন সম্মানিত প্রফেসর।

ইকবাল হাসানঃ একাধারে কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সত্তরের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম। সম্পাদনাও করেছেন বেশ কিছু। নিরলস লিখছেন আজও। জন্ম বরিশাল, ১৯৫২। পড়াশোনা, অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান)। বসবাস--জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বর্তমানে কানাডার টরেন্টো। পেশা, দেশে সাংবাদিকতা এবং বিদেশে কখনো ব্যবসা, কখনো স্রেফ শ্রমজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অসামান্য ব্যবধান' (কবিতা ১৯৮৬), 'মানুষের খাদ্য তালিকায়' (কবিতা ১৯৮৬), 'জ্যোৎস্নার চিত্রকলা' (কবিতা ১৯৯৫), 'দূর কোনো নক্ষত্রের দিকে' (কবিতা ২০০০), 'জলরঙে মৃত্যুদৃশ্য' (কবিতা ২০০৩), 'কপাটবিহীন ঘর' (গল্প ১৯৯৪), 'মৃত ইঁদুর ও মানুষের গল্প' (গল্প ২০০০), 'দূরের মানুষ কাছের মানুষ' (ব্যক্তিগত নিবন্ধ ২০০০), 'আশ্চর্য কুহক' (উপন্যাস ২০০২), 'শহীদ কাদরী কবি ও কবিতা' (সম্পাদনা ২০০৩), 'ছায়ামুখ' (উপন্যাস ২০০৪), 'প্রেমের কবিতা' (কবিতা সংকলন ২০০৪), 'কার্তিকের শেষ জ্যোৎস্নায়' (গল্প ২০০৪) ইত্যাদি।

কমলকলিঃ কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখেন। প্রবাসের বিভিন্ন সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকার তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। হিউস্টন, টেক্সাসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। স্বামী ও সন্তানসহ টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টন শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

কামরুন জিনিয়াঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। লুইজিয়ানা থেকে প্রকাশিত 'আকাশলীনা' সাহিত্য সংকলনের সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স করেছেন ১৯৯৬ সালে। 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-৮৯'তে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম হয়ে আবৃত্তিতে স্বর্ণপদক পান। লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে লোক প্রশাসনে মাস্টার্স করেন ২০০০ সালে। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের Public Policy & Urban Affaris-এ Women & Sustainable Development Policy-তে পি.এইচ.ডি করছেন। উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত।

কেতকী কুশারী ডাইসনঃ জন্ম চল্লিশের দশকে, কলকাতায়। পড়াশোনা করেছেন কলকাতা ও অক্সফোর্ডে। কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুবাদ, নাটক, উপন্যাসসহ সাহিত্যের প্রায় সবগুলো শাখাতেই তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই একজন শক্তিমান লেখক। তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী, যিনি ১৯৬৩ সালে অক্সফোর্ডে 'gain a First in English Literature' অর্জন করেন। তিনি অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করেন। তিনি সেই বিরলপ্রজ কবিদের একজন যে তাঁর মৌলিক কবিতা একই সঙ্গে দু'ভাষাতে রচনা করতে পারছেন। বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ৬টি কাব্যগ্রন্থ, ৩টি উপন্যাস, ৩টি নাটক, ২টি প্রবন্ধ এবং বেশ কিছু অনুবাদ। পাশাপাশি তাঁর ইংরেজী বইয়ের সংখ্যাও অনেক। তাঁর নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে বৃটেন ও ইন্ডিয়া দু'জায়গাতেই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য কলকাতা থেকে সম্মানজনক 'আনন্দ পুরস্কার' পেয়েছেন দু'বার। এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন 'Bhubanmohini Dasi Medal' অ্যাওয়ার্ড। ইংল্যান্ড প্রবাসী।

গুলশান আরা কাজীঃ কবিতা, ছোটগল্প ও নাটক লেখেন। সাহিত্যের প্রায় সবগুলো শাখাতেই দৃপ্ত পদচারণা তাঁর। লিখেছেন প্রায় শতাধিক কবিতা, ছোটগল্প ২০টি এবং ১০টিরও বেশী নাটক। বিগত ২৫ বছর ধরে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এবং প্রচার কাজ করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে বস্টনে 'তরঙ্গ' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পেশাগতভাবে একজন বৈজ্ঞানিক। পদার্থ বিদ্যায় Ph.D. করার পর তিনি LASER Physics এবং Cancer Therapy-তে গবেষণা করেছেন, এবং Harvard Medical School-এ Senior Scientist হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এছাড়াও North America Nazrul Conference Committee, North America Poetry Conference Committee, Boston Soup Poets Association এবং Literary Circle of New England-এর একজন সক্রিয় সদস্য। মূলতঃ তিনি এবং তাঁর স্বামী কাজী বেলাল-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ২০০৪ সালে California State University, North Ridge-এ তাঁরা Nazrul Studies Program চালু করতে সমর্থ হন, যা আমাদের গোটা জাতি তথা বাংলাদেশের জন্যে একটি গর্বের ব্যাপার। অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার আরও বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে Nazrul Studies Program চালু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে ডক্টর গুলশান কানেকটিকা অঙ্গরাজ্যের R & D Division of Cancer Research in CuraGen Corporation-এর একজন বিজ্ঞানী ও Group Leader হিসেবে কাজ করছেন।

জয়ন্ত নাগঃ জন্ম গ্রাম নতুন মিরপুর, পাবনা। বড় হয়েছেন রাজবাড়ীতে। অনিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে নানাধরনের লেখালেখির সাথে যুক্ত এবং ঢাকা-কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তা প্রকাশিত। দেশের বাইরে প্রায় ২৬ বছর। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিকৌশল বিষয়ে পড়াশুনা শেষে পরিবেশ প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন উত্তর আমেরিকাতে। বর্তমানে কানেকটিকা অঙ্গরাজ্যের একটি ক্যামিকেল কোম্পানীতে পরিবেশ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত।

জাহানারা খান বীনাঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। জন্ম ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে' অনার্সসহ এম.এ. পাশ করেন। তাঁর একগুচ্ছ বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ 'Walking Together into Eternity' প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে, যা সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। স্থায়ীভাবে ফ্লোরিডাতে বসবাস করছেন এবং সেখানকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

জাহিদ হোসেনঃ প্রাবন্ধিক ও ফিচার লেখক। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত 'দৈনিক জনপদ'-এ সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর লেখা দেশের ও প্রবাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং সুধীমহলে ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Journalism-এ অনার্স ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. করেছেন। একই

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরবর্তীতে Education-এ মাস্টার্স করেছেন এবং শিক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘকাল। ১৯৯০ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ ফ্লোরিডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্তঃ সাহিত্যে ষাটের দশক নিয়ে যেকোনো বিবেচনার ক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবে যাঁদের নাম উঠে আসবে, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত তাঁদের অন্যতম। জন্ম ১৯৩৯ সালে কুষ্টিয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণযোগাযোগ-এ এম.এস. ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরু ঢাকায়, বাংলা একাডেমীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গণসংযোগ/সম্পাদনার পেশায় কেটেছে দীর্ঘকাল। আটাশ বছর বিদেশ বাসের পর দেশে ফিরে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও 'প্রশিকা'র তথ্য পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব ও তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগেও খন্ডকালীন প্রফেসর ছিলেন একই সঙ্গে। কখনো নিউইয়র্কে কখনো ঢাকায় বাস তাঁর এখন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'দুর্বিনীত কাল', 'বহে না সুবাতাস', 'সিতাংশু তোর সমস্ত কথা', 'পুনরুদ্ধার', 'উড়িয়ে নিয়ে যা কালমেঘ', 'ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়,', 'প্লাবনভূমি', 'মুক্তিযোদ্ধারা', 'জলপরী তো নাচবেই', 'নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি।

দলিলুর রহমানঃ রসায়ন বিজ্ঞানী ডক্টর দলিলুর রহমান একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের মতো শিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ তাঁর। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ছবি আঁকা--সবকিছুতেই দৃপ্ত পদচারণা তাঁর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন চার বছর। এরপর প্রথমে টোকিও ও পরে কানাডাতে রসায়নে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি নিউজার্সীতে Princeton University-তে প্রথমে Research Associate ও পরে Research Staff Member হিসেবে তিন বছর গবেষণা করেন। নিউজার্সী প্রবাসী ডঃ রহমান বর্তমানেও গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লিখতেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'বিতর্ক কেবল সময়ের' এবং যৌথ প্রকাশনা- 'দশ -দিগন্ত' (কবিতা)।

দিলারা হাশেমঃ উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখিকা। জন্ম চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে। যশোহর। ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৭২ থেকে ওয়াশিংটন প্রবাসী। এক সময় বিবিসি-তে এবং বর্তমানে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা ব্রড কাস্টার লেখক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফেডারেল গভর্ণমেন্টের স্থায়ী সিভিল সার্ভিস পদে চাকুরীরত। উপন্যাস, গল্পের পাশাপাশি কবিতা ও নাটক লেখেন। ত্রিশটিরও বেশী প্রকাশিত গ্রন্থের ভেতর ঘন মন জানালা, আমলকীর মৌ, একদা এবং অনন্ত, স্তব্ধতার কানে কানে, কাকতালীয়, হামেলা, গোধূলী বিলাপ, শেষ বিকেলের আলো, মানবীর সুখ-দুঃখ, শেষ রাতের সংলাপঃ টুইন টাওয়ার্স, সিংহ ও অজগর, রাহুগ্রাস, অনুক্ত পদাবলী পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। দেশে ও বিদেশে পেয়েছেন সম্মানজনক বহু পুরস্কার। দিলারা হাশেম কথা সাহিত্যে 'বাংলা একাডেমী' পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৬ সালে। এয়াড়াও কথা সাহিত্যে অনবদ্য অবদানের জন্যে নিউজার্সীতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ সম্মেলন-২০০০' তাঁকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। একই বছর কলকাতা থেকে পান সম্মানজনক 'চোখ সাহিত্য পুরস্কার'। এছাড়াও ১৯৯৪ সালে North American Literary Society থেকে পান 'শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার' এবং ১৯৯৫ সালে Cultural and Literary Linc., Chicago থেকেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিরলস অবদানের জন্যে পান সম্মানজনক পুরস্কার। স্বনামধন্যা দিলারা হাশেম রচিত বেশ কিছু নাটক/সিরিয়াল বিটিভি ও বাংলাদেশের অন্যান্য চ্যানেলগুলোতে প্রদর্শিত হয়েছে এবং ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে।

দীপিকা ঘোষঃ ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে পড়াশুনা করেছেন। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত গ্রন্থ একাধিক - 'জন্মান্তর' ও 'সভ্যতার কালো হাত' উপন্যাস দু'টি উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতি শিল্পীও। বর্তমানে ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যের সিনসিনাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

দেওয়ান শামসুল আরেফীনঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত। রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক আরেফীন এক সময়ে ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক বাংলা গ্রন্থকে 'Twenty Years After the Genocide in Bangladesh' এই নামে অনুবাদ করেছেন। বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউজার্সির প্রাক্তন সভাপতি, ৮ম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন, বস্টন-১৯৯৪ এর উপদেষ্টা এবং ১০ম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন, নিউজার্সী-১৯৯৬ এর পরামর্শক-এর দায়িত্ব পালন করেন। সমাজবিজ্ঞানী এ লেখক বর্তমানে অধ্যাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে - 'মুনাফার সন্ত্রাস' (২০০৫), 'লাইফ এন্ড ডেট-নো ফ্রীডম ইয়েট' (২০০৩), 'ফোর্ট্রেস আমেরিকা, ব্লু স্কার্ট, ডিকনস্ট্রাকশনের গ্লোবালাইজেশন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ' (২০০০) এবং 'তৃতীয় বিশ্বে পাতি বুর্জোয়া ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (১৯৮৮)।

দেওয়ান সৈয়দ আবদুল মজিদঃ কবিতা লেখেন। ১৯৭৭ সালে সিলেট মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস। ইংল্যান্ডের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Physiology-তে ডক্টরেট লাভ করেছেন ১৯৮৯ সালে। বর্তমানে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ট্যুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে Physiology-বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ স্থায়ীভাবে নিউ অরলিন্সে বসবাস করছেন।

নাজনীন সীমনঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। বলার ঢং ও বুনন সৌকর্যে শুরু থেকেই তিনি আলাদা। কবিতা ও গল্প উভয় শাখায়ই স্বতন্ত্র, যদিও স্বল্পপ্রসূ। তাঁর উচ্চারণ পাঠককে ভাবায়, নতুন করে দেখতে অনুপ্রাণিত করে, নিয়ে যায় শিল্পের কাঙ্খিত বন্দরে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ-'আদিগন্ত বিস্তীর্ণতার ঢালে'।

নাজমা খানঃ কবিতা লেখেন। পাশাপাশি প্রবন্ধ। জন্ম সীতাকুন্ড শহর, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। দুই সন্তান নিয়ে নাজমা খান লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে ট্যুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বামী ডক্টর মাহমুদ খানের সঙ্গে বসবাস করছেন।

নাসরিন চৌধুরীঃ গল্পলেখার হাতেখড়ি স্কুলজীবন থেকে। কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। বাংলা সাহিত্যে অনার্স ও এম.এ. করেছেন। দেশের ও প্রবাসের বিভিন্ন জাতীয় সাপ্তাহিকীতে নিয়মিত লিখছেন। ইতোমধ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য দু'টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে-'টুনির পুতুল' ও 'চাঁদের দেশে'। বড়দের জন্যে লেখা তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থ 'একাকী একজন' পাঠকমহলে ভীষণভাবে সমাদৃত। বর্তমানে নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডুকেশনে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৯৫ থেকে নিউইয়র্ক প্রবাসী।

নাসরীন খান রুমাঃ কবিতা লেখেন। ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। প্রবাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। টরন্টো, কানাডা প্রবাসী।

নূরুন নবীঃ ১৯৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ডঃ নূরুন নবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণরসায়ন বিষয়ে বিএসসি (অনার্স) এবং এমএসসি করেন। পরবর্তীতে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডিপ্লোমা, ক্যিউশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং আমেরিকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টোরাল করেন। ৭০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রথম সিনেটের সদস্য। ১৯৮০ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। পেশায় গবেষক-বিজ্ঞানী। বর্তমানে একটি বহুজাতিক কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী। তাঁর পেটেন্টকৃত আবিষ্কারের বর্তমান সংখ্যা ৫৫। বিজ্ঞানের পেশাদারী জার্নালে তাঁর ৫০টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৭-৭১ মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলিতে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রকর্মী, ১৯৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা, টাঙ্গাইলের বাঘা কাদের সিদ্দিকীর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা, ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ বর্ণিত টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর 'ব্রেইন', মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য প্রধান সেনাপতি কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অভিজ্ঞানপত্র প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'জন্মোছি এ বাংলায়' এবং 'আমার একাত্তর আমার যুদ্ধ' পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বর্তমানে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যে সপরিবারের বসবাস করছেন।

পার্থ ব্যানার্জীঃ গত দুই দশক ধরে আমেরিকা প্রবাসী। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কেটেছে কলকাতায়। নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য জায়গায় অ্যাক্টিভিজম ও লেখালেখির সূত্রে তিনি এখন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। জীববিজ্ঞানী ও সাংবাদিক ডক্টও ব্যানার্জী বর্তমানে আমেরিকার নতুন ইমিগ্র্যান্ট অধিবাসীদের মধ্যে মানবাধিকার আন্দোলনের কাজ করছেন। যুদ্ধবিরোধী ও ন্যায়-বিচার সংগঠনগুলোর সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সন্ত্রাস, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সাংস্কৃতিক ডামাডোল বিষয়ক রচনা তাঁকে এদেশেও ও ওদেশে আরো পরিচিত করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'সোজা সন্ত্রাস বাঁকা সন্ত্রাস আধা সন্ত্রাস গোটা সন্ত্রাস' পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

পূরবী বসুঃ একাধারে বিজ্ঞানী, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। জন্ম মুন্সীগঞ্জে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ করেছেন ফার্মেসীতে অনার্সসহ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেল কলেজ অব পেনসিলভ্যানিয়া ও ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরী থেকে লাভ করেছেন যথাক্রমে প্রাণ-রসায়নে এম.এস. ও পৃষ্টিবিজ্ঞানে পিএইচডি। বিজ্ঞানচর্চা তাঁর পেশা। নিউইয়র্কের বিশ্ববিখ্যাত মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যান্সার সেণ্টারে গবেষণা ও কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন বেশ কিছুকাল। অজস্র গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সারা বিশ্বের নানা নামি জার্নালে। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আজন্ম পরবাসী', 'সে নহি সে নহি', 'পূরবী বসুর গল্প', 'নিরুদ্ধ সমীরণ', 'গল্পসমগ্র', 'একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত' এবং 'অনিত্য অনিন্দ্য'। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ঔষধ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান ওয়ায়েথ ফার্মাসিউটিক্যালসে কর্মরত।

ফকির ইলিয়াসঃ কবি ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬২, সিলেটে। পড়াশোনা করেছেন বাংলা সাহিত্যে। বাংলাদেশের ও প্রবাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ ও কলাম লিখেন। দীর্ঘদিন থেকে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'বাউলের আর্তনাদ', 'হৃদে গাঁথা মালা', 'বৃত্তের ব্যবচ্ছেদ', 'অবরুদ্ধ বসন্তের কোরাস' এবং গীতিকবিতা 'অনন্ত আত্মার গান' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। যৌথ কাব্যগ্রন্থ - 'এ নীল নির্বাসনে'।

ফারহানা ইলিয়াস তুলিঃ নিউইয়র্কের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পরিচিত কবিদের একজন। কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্প লেখেন। সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা কবিতাপত্র 'কালিক'-এর সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে – 'প্রজন্মের সেতুবন্ধন', 'হৃদয় ছুঁয়ে যাক ভালোবাসায়' এবং 'নেমে আসে সন্ধ্যার স্বর'।

ফেরদৌস জেসমীনঃ মূলতঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। উত্তর আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন – একসময় লস এঞ্জেলেস, তারপর বস্টন, সম্প্রতি মহানগর নিউইয়র্কে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'জোছনার অমল বৃষ্টিতে', 'আমার সারাদিন সারাবেলা', 'আলোর আভাস', 'তারা' এবং 'নার্সিসাস এর আরশি' সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

ফেরদৌস নাহারঃ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১০টির মতো। 'সময় ভেঙেছে সংশয়', 'সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো'-সহ প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ সুধীমহলে ব্যাপকবাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও কবিতা বিষয়ক তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কবিতার নিজস্ব প্রহর' সাহিত্য অঙ্গনে নতুন একটি মাত্রা যোগ করে। তিনি 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। টরেন্টো, কানাডাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

বদিউজ্জামান নাসিমঃ জন্ম বরিশালের শিরযুগ গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এস.সি। বর্তমানে বস্টন প্রবাসী এবং সেখানকার একটি মানসিক হাসপাতালে কর্মরত। মূলতঃ কবিতা লেখেন। সম্পাদিত সংকলন - নীলিমার নীলক্ষেত, জেব্রা ক্রসিং, মাল্টিস্টোরীড দুঃখশোক ইত্যাদি। 'ভিন-গোলার্ধ' নামে প্রবাসে একটি বাংলা ভিত্তিক উদ্যোগের অন্যতম রূপকার।

বিমল কান্তি পালঃ কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখেন। ষাট ও সত্তুরের দশকে প্রচুর লিখতেন ঢাকার পত্রিকাগুলোতে। বর্তমানে Kansas State University-তে ভূগোলের অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ভূগোল পড়িয়েছেন ১৯৭৪-৭৮ সাল পর্যন্ত। ক্যানসাস অঙ্গরাজ্যের ম্যানহাটান-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

মনি মোজাম্মেলঃ মূলতঃ কবিতা লেখেন। ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। দীর্ঘদিন থেকে প্রবাসী (প্রথমে জামার্নী), বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বামী ও দুই কন্যা নিয়ে বসবাস করছেন। উল্লেখ্য তাঁর স্বামী মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু একজন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক। জনপ্রিয় কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলন তাঁর ছোট ভাই। মনি মোজাম্মেল লেখালেখির সঙ্গে জড়িত স্কুল জীবন থেকেই। একসময় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আমার দেশ' পত্রিকার মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন। এছাড়াও তিনি প্রবাসের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। বই প্রকাশের ব্যাপারে কিছুটা অনাগ্রাহী হলেও লিখছেন নিরলস আজও।

মনিরা বেগমঃ ১৯৯৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যের কলম্বাস শহরে স্বামী-সন্তানসহ বসবাস করছেন। লেখালেখি ও সংবাদপত্রের সাথে জড়িত হবার সূচনা বাংলাদেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ঠিকানা'র কলম্বাস প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা। প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও মতামত লিখে থাকেন। তাঁর লেখা নিয়মিত বের হচ্ছে দেশের ও প্রবাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

মাসুদুল আবেদঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই লিখছেন। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ইংরেজী কবিতার জন্যে। পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি করেছেন। স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ কানাডাতে বসবাস করছেন।

মিনা ফারাহঃ পেশায় ডেন্টিস্ট এবং ২৩ বছর নিউইয়র্ক প্রবাসী। লেখালেখির শুরু ১৯৯৩ থেকে। বিভিন্ন ইস্যু ও ক্রাইসিসে নিউইয়র্কের বাঙালী কম্যুনিটিতে এক প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং কলম-যোদ্ধা। বিভিন্ন একটিভিস্ট সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত যার মধ্যে সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন, সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট গ্রুপ এবং আই.ই.এইচ.ই অন্যতম। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একাধিক। উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো - কাঠগড়ায় ঈশ্বর, সুখ তোর বাড়ি কই, প্রবাসের খোলা বোতাম, মধ্য বয়সের সঙ্কট এবং নারীর জীবন যৌবন বার্ধক্য। একুশে বইমেলা ২০০৬-এ তাঁর আরও বেশ কিছু নতুন বই এসেছে।

মীজান রহমানঃ উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখক। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী প্রমুখের সমসাময়িক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই লেখক পেশাগত জীবনে কানাডার অটোয়াস্থ কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। একটানা তেত্রিশ বছর শিক্ষকতা করে অবসর নেন ১৯৯৮ সালে। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন Distinguished Research Professor হিসেবে কর্মরত আছেন। গণিত শাস্ত্রের প্রখ্যাত পন্ডিত জর্জ গ্যাসপারের সঙ্গে রচিত তাঁর গণিতবিষয়ক গ্রন্থ, আধুনিক গণিতের একটি উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। লেখক তাঁর সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতালব্ধ মনীষার আলোকে রচনা করে যাচ্ছেন অজস্র ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও আখ্যানমঞ্জরী। তাঁর প্রকাশিত রচনার সুনির্বাচিত সঙ্কলন 'তীর্থ আমার গ্রাম', 'লাল নদী', 'অ্যালবাম', 'অনন্যা আমার দেশ' ও 'প্রসঙ্গঃ নারী' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

মুকতাদীর চৌধুরী তরুণঃ কবিতা লিখছেন সত্তরের দশক থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানে এম.এস.সি এবং পরে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য থেকে এম.এস.সি করেন। ১৯৮৯ থেকে আমেরিকা প্রবাসী এবং মলিক্যুলার বায়োলজীতে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন। কবিতা পরিষদ ও রাইটার্স ক্লাব, লস এঞ্জেলেস শাখার সভাপতি এবং স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

মুনীর মুজতবা আলীঃ কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখেন। বাংলা ও ইংরেজী দু'ভাষাতেই লিখে থাকেন। ডক্টর আলী লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত। দুই পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রীসহ লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ব্যাটন রুজে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

মুসাররাত জাহান শ্বেতাঃ কলাম, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ছোটগল্প লেখেন। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'যায় যায় দিন'-এ নিয়মিত লিখছেন প্রবাস থেকে। পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি এবং যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগানের Wayne State Universiyt থেকে এমএসসি করেন। স্বামী ও দুই সন্তানসহ ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যের পেরিসবার্গে বসবাস করছেন।

মোজাম্মেল হোসেন মিন্টুঃ বিক্রমপুরের কৃতি সন্তান মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান-এ অনার্সসহ এম.এ. করেছেন। ছাত্রজীবনেই লেখালেখির শুরু। একাধারে ঔপন্যাসিক, কলামিস্ট এবং নাট্যকার। ১৯৬৮ সালে কিছুদিন বাংলাদেশ রেডিও-তে সংবাদ পাঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবাদিকতাও করেছেন 'Evening Post'-এ বেশ কিছুকাল। ১৯৭২-৭৩ সালে চলচ্চিত্র পরিচালনার সাথেও সম্পৃক্ত হন। ১৯৮৩ সাল থেকে নিউইয়র্কে বসবাসকালীন সময়ে, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় পত্রিকা 'ঠিকানা'-য় ধারাবাহিক কলাম লিখে পাঠক মহলে আলোড়ণ জাগান। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্যে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু 'কথা সাহিত্যে' সম্মানজনক 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' পান ২০০৪ সালে। উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন ফোবানার 'সাহিত্য অ্যাওয়ার্ড' পান ২০০০ সালে। এছাড়া বাংলাদেশ পালক শিশু সাহিত্য সংসদ থেকে পান 'পালক অ্যাওয়ার্ড' ২০০০ সালে এবং একই বছর 'Guild Award স্বর্ণপদক' পান Bangladesh Book Development & Writers' Guild (BBDWG) থেকে। তিনি Bangladesh Writers & Journalists Association (North America)-এর উত্তর আমেরিকা চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট।

মোস্তফা সারওয়ারঃ কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লেখেন। উত্তর আমেরিকার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। পেশায় একজন বিজ্ঞানী। বর্তমানে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিন্সে জিওফিজিক্স এর অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। স্ত্রী ডঃ সাঈদা সারওয়ার ও তিন সন্তানসহ নিউ অরলিন্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

রবিউল হাসানঃ খ্যাতনামা গল্পকার, কবি ও অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মালয়েশীয়ার চল্লিশটিরও বেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিমা এসেই বলে, যাই' ও 'এই শহরে একটা কোনো বিকেল মানেই' সুধীমহলে সমাদৃত। 'প্রিয়ার সঙ্গে চার বেলা' তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। লেখক বর্তমানে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ণ ইউনিভার্সিটি ইন ব্যাটন রুজ-এর ইংরেজীর প্রভাষক।

রানু ফেরদৌসঃ ছোটগল্প, কলাম ও প্রবন্ধ লেখেন। মাঝে মধ্যে কার্টুনও আঁকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএসএস (অনার্স) ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পড়শী'-র নিউইয়র্ক প্রতিনিধি। নিউইয়র্কের 'উদাচী স্কুল অব পারফর্মিং আর্টস'-এর বাংলার শিক্ষক। এছাড়াও তিনি 'ইউনাইটেড নেশনস্ উইমেনস গিল্ড' কুইন্স শাখার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। স্বামী ও দুই সন্তানসহ নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

রুকসানা রূপাঃ মূলতঃ কবিতা লেখেন। কবিতা ছাড়াও তিনি চমৎকার গদ্য এবং ছোটগল্প লেখেন। রূপা নব্বুই দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। উত্তরাধুনিক কবিতায় তিনি ২০০১ সালে 'শব্দগুচ্ছ' পুরস্কার পান। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম--'গরাদবিহীন জানালায় অপেক্ষার কিশোরী'। নিউইয়র্ক প্রবাসী।

রেজাউর রহমানঃ খ্যাতিমান আইনজীবী। আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'আইন ও আদালত' অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় ও স্বনামধন্য উপস্থাপক। কবিতা লেখেন। বর্তমানে সপরিবারের কানাডায় বসবাস করছেন। এবছর বইমেলায় (২০০৬) স্বরব্যাঞ্জন থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পাথরে লুকানো আগুন'।

রোকসানা লেইসঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। ছবি আঁকেন সময় পেলেই। প্রকৃতি-প্রেম তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'স্বপ্ন নগরীর খোঁজে'। টরেন্টো, কানাডা প্রবাসী।

লিয়াকত হুসেন আবুঃ কলাম ও রম্য লেখক হিসেবেই বেশী পরিচিত। সাংবাদিক। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও বিচরণ আছে তাঁর। জন্ম ১৯৫৯ সালে সিলেট জেলায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রী এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম-এর ওপর এমএস করেন। বর্তমানে তিনি আটলান্টায় একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে ইনফরমেশন টেকনোলজির ম্যানেজার। বহুদিন শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন। উত্তর আমেরিকায় বাংলা সংবাদপত্রের শুরু থেকে একজন লেখক। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাংলাদেশ রাইটার্স এন্ড জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-আহবায়ক। স্ত্রী ও সন্তানসহ আটলান্টায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

লুৎফর রহমান রিটনঃ বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান ছড়াকার। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তাঁর বয়সের প্রায় দ্বিগুন। ছড়া ছাড়াও তিনি চমৎকার গদ্য লেখেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রিটন বর্তমানে কানাডার অটোয়ায় স্ব-নির্বাসিত। তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রবাসে রচিত পঙক্তিমালা'।

শবনম আমীরঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। প্রবাসী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখছেন। ভ্রমণ বিলাসী ও সুদূরপিয়াসী এই লেখিকা আফ্রিকা, ইউরোপ ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, বিশেষ করে বাঙালিদের সুখ-দুঃখের যে চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন তাঁর কবিতায় ও গল্পে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ বেহাগ' এবং গল্প-সমগ্র 'নিহত কৃষ্ণচূড়া' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। স্বামী ও সন্তানসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ক্যালিয়োর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে।

শামস-আল-মমীনঃ আমেরিকা থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. এবং এম.এ. করেছেন। কবিতা লেখেন। অনুবাদও করছেন। তাঁর অনূদিত বেশ কিছু কবিতা ইতোমধ্যেই সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দু'টি - 'মনোলগ' এবং 'চিতায় ঝুলন্ত জোছনা'। সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'আ-কার ই-কার'। ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লিখে থাকেন। বর্তমানে নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডুকেশনে Mentor (মেন্টর) হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৮২ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

শামসুর রহমানঃ কবি ও প্রাবন্ধিক। লিখেন বাঙালী শামসুর রহমান নামে। প্রবাসের পত্র-পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে লিখছেন নিয়মিত। দেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর বহু দেশে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে হিউস্টন কমিউনিটি কলেজ ও ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনে ইংরেজী পড়ান। হিউস্টনের একটি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। লেখক মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের প্রগতিশীল স্বাধীনতার পক্ষের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। লেখকের জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দু'টি এবং 'Creation of Bangladesh--Historical Facts' এ নামে নতুন প্রজন্মের শিশুদের জন্যে ইংরেজী ও বাংলাতে সর্বমোট ৩টি বই প্রকাশের পথে।

শামসুল হুদাঃ কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। নিউ অরলিন্স থেকে প্রকাশিত একুশে সংকলন 'অবিনাশী শব্দরাশি'র সম্পাদক, প্রকাশ করছেন গত চৌদ্দ বছর যাবত। এক সময়ের বেতার সংবাদপাঠক, সাংবাদিক ও আবৃত্তিকার। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। বর্তমানে লুইজিয়ানার জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান। স্ত্রী ও দু'সন্তান নিয়ে নিউ অরলিন্সে বসবাস করছেন।

শামীম তুষারঃ প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কলাম লেখেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস করেছেন ১৯৯৭ সালে। লুইজিয়ানা প্রবাসী এবং এ অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত ট্যুলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএইচ করেছেন। বর্তমানে OPH, New Orleans-এ কর্মরত আছেন। একসময় বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'যায় যায় দিন'-এ নিয়মিত লিখতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অন্য স্বাদের কমপিউটার' পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

শারমিন আহমেদঃ কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও নিবন্ধ লেখেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা। ১৯৮৪ থেকে আমেরিকা প্রবাসী। তিনি ১৯৯০ সালে ওয়াশিংটন ডিসি-র জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলোশীপ ও উইমেন স্টাডিজ স্কলার্স এ্যাওয়ার্ডসহ উইমেন্স স্টাডিজে মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিশু শিক্ষার ওপরেও মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। বিশ্বের পেশাজীবী নারীদের অন্যতম বৃহত্তম মানব উন্নয়ন সংগঠন দ্যা সরোপটিমিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অব দ্যা আমেরিকাস 'আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সমঝোতা রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের' জন্য তাঁকে 'উইম্যান অব ডিস্টিংশন' এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) গ্রন্থ 'হৃদয়ে রঙধনু' (The Rainbow in A heart) সুধীমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও ব্যাপক প্রশংসিত হয়। সম্প্রতি বইটি আমেরিকার ম্যারিল্যান্ড স্টেটের মন্টোগোমারি কাউন্টির পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কারিকুলামের জন্য মনোনীত করেছে। মানের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক স্কুলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পরিচিত মন্টোগোমারি কাউন্টি পাবলিক স্কুল 'হৃদয়ে রঙধনু'-র চূড়ান্ত অনুমোদনে এই গ্রন্থটিকে সমবিষয়ের যে কোনো গ্রন্থের তুলনায় অদ্বিতীয় হিসেবে অভিহিত করেছে। সুন্দর চিত্রকর্ম, ভাষার

নিপূণতা এবং গল্পের বর্ণনা সাবলীল বলেও প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়া শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির মায়েদের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিশুর উপযুক্ত অভিভাবক হওয়ার শিক্ষা, বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, আধ্যাত্মিক নীতিমালার সংযোগ, সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এবং সব প্রাণের উৎসেই ভালো দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাকে গল্পের শক্তিশালী দিক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শাহেদ ইকবালঃ কবিতা ও নাটক লেখেন। ঢাকার একটি মঞ্চ নাট্যদলের সঙ্গে কাজ করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। অভিনয় করেন। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা থেকে এমবিবিএস করেছেন ২০০০ সালে। বর্তমানে লুইজিয়ানা প্রবাসী এবং এ অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত ট্যুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে Epidemiology-তে পিএইচডি করছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ একটি -'ভিখিরি হবো, না সন্ন্যাসী'।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালঃ একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও গবেষক। পেশা সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা। প্রকাশিত গ্রন্থ ৩৫টি, কবিতা ১৫টি। এবারের বইমেলা-২০০৬ এ বের হয়েছে তাঁর 'কবিতা-সমগ্র'। তিনি প্রবাসীদের নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছেন। বর্তমানে অটোয়াতে অবস্থান করছেন এবং ক্যানাডিয়ান আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের নিয়ে গবেষণা করছেন।

সাঈদ-উর-রবঃ নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। শক্তিমান লেখক ও সাংবাদিক। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক বিক্রিত ও সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্র 'ঠিকানা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বর্তমানে তিনি 'ঠিকানা' পরিবারের প্রেসিডেন্ট/সিওও পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি American News Agency, ANA-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। উত্তর আমেরিকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। সাবেক জাতীয় অ্যাথলেট চ্যাম্পিয়ন জনাব রব উত্তর আমেরিকাতে আসার পূর্বে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে সপরিবারে নিউইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সাহেরা আফজা টুলুঃ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। লেখালেখির শুরু স্কুলে পড়াকালীন সময়ে দেয়াল পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে। অনিয়মিত হলেও তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ দেশের ও প্রবাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৯ সাল থেকে আমেরিকা প্রবাসী। স্বামী ডঃ মইনউদ্দিন আফজা এবং তিন সন্তানসহ পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের ব্লুমসবার্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং একজন রেজিস্টার্ড নার্স হিসাবে চাকরী করছেন।

সুরাইয়া খানমঃ একাধারে গবেষক, ঔপন্যাসিক এবং কবি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স গ্রাজুয়েশান ও ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার টুসান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান সাহিত্যে এম.এ ও ডক্টরেট করেন। এক সময়ের করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক, বর্তমানে অ্যারিজোনার একটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন। বই প্রকাশের ক্ষেত্রে ততোটা আগ্রহী না হলেও সুরাইয়া খানম নিয়মিত লিখছেন আজও। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'নাচের শব্দ' পাঠকমহলে আলোড়ণ জাগায়।

সুলতান পারভেজঃ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। Louisiana State University at Alexandria-তে পদার্থ বিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত। স্ত্রী ও সন্তানসহ আলেকজান্দ্রিয়া, লুইজিয়ানাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সোহেলী সুলতানাঃ কবিতা লেখেন। জন্ম বৃহত্তর মাদারীপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত শিরখাড়া মিয়া পরিবারে। লেখালেখির শুরু ছোটবেলা থেকেই। পরবর্তীতে স্কুল-কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'বিপরীত চলাচল'। দ্বিতীয় প্রকাশনাটি ছিলো ছোট্ট সোনামণিদের জন্য ছড়া-ছবির বই 'ছড়ায় ছন্দে'। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে স্বামী-সন্তানসহ ফ্লোরিডা প্রবাসী। লেখিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে লিখছেন নিয়মিত। এছাড়াও ফ্লোডিয়ার মায়ামীতে 'শিল্পাংগন' নামের একটি সাহিত্য-সংস্কৃতির আসর মাসিক ভিত্তিতে চালিয়ে আসছেণ বিগত পাঁচ বছর ধরে।

হারুন চৌধুরীঃ মুক্তিযোদ্ধা হারুন চৌধুরী একজন স্বনামধন্য লেখক ও দীর্ঘদিন যাবত সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। ১৯৭৯ সালে 'ইউএনডিপি'-র মাধ্যমে বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলেতের শেফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং তখন থেকে ওয়াশিংটন প্রবাসী। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ওয়াশিংটন ডিসি-এর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি এ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনালের (AMI) একজন সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে কম্পিউটার Data Center Specialist হিসেবে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'এই নারী' প্রসংসার দাবীদার।

হাসান-আল-আবদুল্লাহঃ ছান্দসিক কবি হিসেবে খ্যাত। আশির দশকের মাঝামাঝিতে কবিতা দিয়ে লেখালেখির শুরু। তিনি একজন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক কবিতার কাগজ 'শব্দগুচ্ছ'-এর সম্পাদক। তাঁর সম্পাদিত 'মার্কিন দেশের বাংলা কবিতা' সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসা পায়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ 'কবিতার ছন্দ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য বিভাগের পাঠ্য। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'একবিংশ শতাব্দীর আগে', 'গোলাপের নাম তুমি', 'শকুনেরা ভালো আছে', 'সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য কবিতা', 'আঁধারের সমান বয়স' এবং কিশোর উপন্যাস 'আহত মুকুল' প্রশংসার দাবীদার। তাঁর ৬টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থসহ মোট গ্রন্থসংখ্যা ১৭টির মতো। ১৯৯০ থেকে নিউইয়র্ক প্রবাসী। বর্তমানে তিনি New York City Board of Education-G Math (Calculus) and Computer Programming-এ শিক্ষকতা করছেন।

হাসান ফেরদৌসঃ স্বনামধন্য ও খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক। বর্তমানে স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে বাস করছেন। লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী সাহিত্যে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়েছেন উক্রাইনের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ১৯৮২ সালে ঢাকার জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে যোগ দেন। এরপর ১৯৮৯ থেকে নিউইর্য়কে জাতিসংঘ সদর দফতরে। ১৯৯৫-তে বেইজং-এ বিশ্ব নারী সম্মেলনে জাতিসংঘের তথ্য সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অন্য সময় অন্য পৃথিবী', 'নান্দনিক নৈতিকতার সপক্ষে ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'নাগরিক সময় ও

অন্যান্য বিবেচনা' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গতবছর (২০০৫) তাঁর দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ বেরিয়েছে, একটি - 'বৃষ্টিকে নিয়ে রূপকথা' এবং অন্যটি-'নক্ষত্র পুত্র'।

হায়দার আলী খানঃ একাধারে কবি, প্রবন্ধিক ও অনুবাদক। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই লিখে থাকেন। বাংলা ও ইংরেজী মিলিয়ে মোট গ্রন্থসংখ্যা ১২টির মতো। তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতার অনুবাদগ্রন্থ-'অক্টাভিও পাজ' এবং জাপানী কবি 'বাশো'র অনুবাদ প্রবন্ধগ্রন্থ- 'ওকুর সরুপথ' পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এছাড়াও অনুবাদ করেছেন জাপানের গত ১০০ বছরের কবিতা। এক সময়ের বাংলাদেশ রেডিও টেলিভিশনের সঙ্গীতশিল্পী ও আবৃত্তিকার ডক্টর হায়দার খান পেশাগত জীবনে একজন অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ। তিনি University of Denver, CO তে Economics-এর একজন নামকরা অধ্যাপক। তাঁর বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধের বই প্রকাশের পথে। ডেনভার, কলোরাডোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

হেলেনা খানঃ প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয়া হেলেনা খানের জন্ম ময়মনসিংহে, ১৯২৯ সালে। বর্তমানে বসবাস করছেন কানাডাতে। ছোটদের ও বড়দের মিলিয়ে সর্বমোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০টি। আজও নিরলস নিজেকে একান্তভাবে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত রেখেছেন। স্বনামধন্যা এই লেখিকা 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' পান ২০০১ সালে। এছাড়াও পেয়েছেন অসংখ্য সম্মানজনক পুরস্কার, তার মধ্যে ২০০১ সালে 'কমর মুশতারী স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' ঢাকা, ২০০০ সালে 'সেবা-সংঘ (সাহিত্য) পুরস্কার' ময়মনসিংহ, 'কমল-কুঁড়ি শীর্ষ দশ (সাহিত্য) পুরস্কার' - ঢাকা, 'ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক' - ঢাকা, ১৯৯৪ সালে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে 'নাজ ট্রাভেলস্ স্বর্ণপদক ১৯৯৪' লাভ, ১৯৯২ সালে শ্রেষ্ঠ মহিলা কথাশিল্পী হিসেবে 'সাজিদুন্নেসা খাতুন চৌধুরানী সাহিত্য পদক' লাভ, একই বছর সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব পদক' লাভ এবং ১৯৮৯ সালে 'ময়মনসিংহ মহিলা পরিষদ' প্রদত্ত সাহিত্যে সম্মাননা ও পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।

হোমায়রা আহমেদঃ গল্প, কবিতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও নারী বিষয়ক নিবন্ধ লিখে থাকেন। তিনি মুসলিম মহিলা লেখকদের (বেগম রোকেয়ার আগে ও পরে) ওপর গবেষণা কর্মে রত। পেশাগত জীবনে একজন স্থপতি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্থাপত্য ফার্মে কর্মরত। ইতোমধ্যেই তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অন্যরকম মেয়ে', কাব্যগ্রন্থ 'আমি তো আমি না' এবং নারী ও সমাজ বিয়ষক গ্রন্থ 'জীবন যেমন দেখেছি' প্রকাশিত হয়েছে। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া-তে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

'আকাশলীনা' উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাঙালী কবি ও লেখকদের একটি বাৎসরিক কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ২০০১ সালে, বাংলা ১৪০৮, পহেলা বৈশাখে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত 'আকাশলীনা'র পাঁচটি সংখ্যাই উত্তর আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়। এ বছর ২০০৬ সালে 'আকাশলীনা'র ষষ্ঠ সংখ্যাটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে বই আকারে 'বাংলা নববর্ষ-১৪১৩' তে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আমি খুবই আনন্দিত। স্বরব্যাঞ্জন-এর কর্ণধার কবি ও লেখক শ্রদ্ধেয় সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা বইটি প্রকাশে তাঁর সার্বিক সহায়তার জন্যে।

উত্তর আমেরিকাতে আজ বহু বাঙালীর বাস। শুধু এখানে কোনো, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালীরা। এই ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সামনের টান এবং পেছনের ধাক্কা দু'টোই কাজ করেছে। আজ থেকে এক দশক আগে যা কল্পনা করা যেতো না, এখন তাই সম্ভব হচ্ছে। অভিবাসী জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। অভিবাস জীবনের সকল প্রতিকুলতাকে অতিক্রম শুধু নয়, তীব্র প্রতিযোগিতাও করছেন বাংলাদেশীরা। তথ্য-প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর সময়ে সারা পৃথিবী হঠাৎ করে ছোট হয়ে এসেছে। দূরত্ব আর দূরত্ব নয়, দেশের সীমানা এখন একটি আনুষ্ঠানিকতার মতো।

বাংলাদেশ দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। কিন্তু আমাদের হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি দরিদ্রতম নয়। সারা বিশ্বের সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে বাঙালী সংস্কৃতি কিন্তু খুবই উঁচুতে। অর্থ ও সংস্কৃতি এক সূত্রে বাঁধা নয়। আমাদের একটি বড়ো ঐতিহ্য আছে, বড়ো সংস্কৃতি আছে, ধর্ম-নিরপেক্ষতা আছে। আমাদের এই সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালীদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব অনেক। আমাদের যে উৎস সেই উৎসের সংস্কৃতির সাথে সকল প্রবাসী বাঙালীদের উচিত নিজেদেরকে বহমান রেখে দেওয়া। গত ছয় বছরে 'আকাশলীনা'র সংখ্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে যেয়ে আমি অনুভব করেছি, বলা যায় আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, প্রবাসী কবি ও লেখকরা কোনো অংশে পিছিয়ে নন–তাঁরা প্রচন্ড ভালো লিখছেন। পাঠকরা তা আরও ভালো বিচার করতে পারবেন। এখন খুব প্রয়োজন প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলা--বাঙালী সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখা। এখানে, এই প্রবাসে, আমাদের একটি সমাজ তৈরি হয়ে গেছে। সেই আমাদের আশা-প্রত্যাশা আছে, প্রাপ্তির আনন্দ আছে, না-পাওয়ার হতাশা আছে, আছে স্বপ্ন, ভালোবাসা, লক্ষ্য আর সর্বোপরি প্রবাসের কঠিন জীবন-সংগ্রাম। নিরন্তর একটি সংস্কৃতির মেধা-মননের চর্চা করার মতো যদি একটি গোষ্ঠী বা পরিমন্ডল গড়ে না ওঠে, তাহলে তো যা কিছু অর্জন পরে সবটাই ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে যাবে। প্রবাসে এখন এতো ভালো লেখক, কবি, মেধাবী মানুষ আছেন যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মতো ঘটনা বা সাংস্কৃতিক গতিশীলতা সম্প্রাণ হয়ে থাকতে পারে--'আকাশলীনা' সাহিত্য সংকলনটি সে ধরনেরই একটি বোধ, আবেগ, ইচ্ছা বা স্বপ্নের ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

নিরন্তর ধন্যবাদ সকল প্রবাসী কবি ও লেখকদের, কাছের ও দূরের, যাঁরা শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসের এ যান্ত্রিক জীবনে লেখা পাঠিয়েছেন মনে করে, ভালোবেসে, বড়ো যত্ন করে-

-সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সংকলনটিতে লেখাগুলো লেখক ও কবিদের নামের বাংলা আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, অন্য কোনো মানদন্ডে নয়। আমার বিশ্বাস, লেখাগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। সব না হলেও অন্ততঃ একটি লেখাও যদি কারো ভালো লাগে, আমি আমার এ পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সফলতা মনে করবো।

ধন্যবাদ ও আমার আন্তরিক অভিনন্দন 'আকাশলীনা'র পৃষ্ঠপোষকতায় এবার যাঁরা ছিলেন, যাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত না হলে 'বাংলা নববর্ষে' বইটি প্রকাশ করা কঠিনই হতো। আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি। আপনাদের সহযোগিতা আমার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

শেষে শুধু বলবো, একটি জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। আর যুগ যুগ, শতবর্ষ ধরে যে সংস্কৃতির বীজ আমরা বহন করছি, তা শত বাধা-বিপত্তিতেও উপ্ত রয়ে যাবে আমাদের মনে--এই প্রবাসে, বা অন্য কোনোখানে, যতো দূরেই থাকিনা কেনো, সেই শেকড়ের সাথে সংযোগ যেনো কখনোই বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে--এই হোক প্রত্যয়!

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

কামরুন জিনিয়া
নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা।
ইউ,এস,এ
১৪ই এপ্রিল, ২০০৬
১লা বৈশাখ, ১৪১৩